সংকলন - ৩। জুলাই ২০১৩

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষা

পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার মূল নীতিই হচ্ছে "বিকেন্দ্রীকরণ"। এই শব্দটার মধ্যে জড়িয়ে আছে মানুষের মতামত, সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতা এবং তাদের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে উন্নয়নের চাবিকাঠি। এই নীতিটির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই তা বোঝা যায়। তেমনি অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি শুধুমাত্র সরকারী শিক্ষা দপ্তরের হাতে আছে বলে স্বীকার করে নিই, তাহলে তারাই আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলকেন্দ্রে থাকে। বিকেন্দ্রী-করণের নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ না করে শিক্ষাকে সমাজ ও পরিবার থেকে গ্রামের স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান এবং গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষা চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। বহির্জগতের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ ঘটবে না। আসলে দৈনন্দিন জীবনের বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগাবার বড় অস্ত্রই হচ্ছে "শিক্ষা"।

শিক্ষা যে জীবনের সবচেয়ে জরুরী বিষয় সে সম্বন্ধে সমাজের পিছিয়ে পড়া দূর্বল গোষ্ঠীগুলির খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা নেই। শিক্ষায়তনের পরিকাঠামো তৈরি ব্যয় সাপেক্ষ, তবুও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা যতটা হয় সে তুলনায় আঞ্চলিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বা বিষয় কি হবে সেসব নিয়ে প্রায় ভাবা হয় না বললেই চলে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমাজ বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিয়েই তৈরি আর সেই সমাজের আঞ্চলিক জ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে রাখা দরকার। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটা কে নেবে ?

এখানেই কিন্তু আমাদের স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের জাতীয় পাঠ্যক্রম ও রাজ্য পাঠ্যক্রমও স্থানীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সমাজেরই একটা অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে। তাই অঞ্চলের পাঠ্যক্রম কেমন হওয়া দরকার সেটা পঞ্চায়েতেরই ঠিক করা উচিত। আঞ্চলিক বিষয় নির্ধারণ করার জন্য সেখানকার স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থাকতে হবে।

দেখা যাচ্ছে MSK, SSK গুলি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ পঞ্চায়েত দ্বারা চালিত হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা তুলনায় অনেক বেশী।

আগেই বলা হয়েছে, "শিক্ষা" কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। আবার এটা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারও নয়। সমাজ ও জনগোষ্ঠী, পরিবার এবং সেই অঞ্চলের চাহিদার ভিত্তিতেই শিক্ষার বিষয়বস্তু স্থির হওয়া দরকার। আর অবশ্যই দরকার স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের একটা যথাযথ উদ্যোগ।

তবেই শিক্ষার সঙ্গে সমাজের একটা সেতু বন্ধন রচিত হবে। তখনই বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার প্রয়োগ সফল হবে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

জাতীয় পাঠ্যক্রম কার্যসূচী, ২০০৫-এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহে স্কুলে "পুষ্টি - বাগান"

শিশুদের হাতে কলমে কৃষিকাজ শেখানো এবং পুষ্টির বিষয়ে তাদের প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য তাদের নিজেদের স্কুলেই বাগান করার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষকদের সাথে গ্রাম পঞ্চায়েত । এটা পরীক্ষিত যে, শিশুরা গাছের বিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল হয়, অবশ্য সবটাই নির্ভর করে তাদের কিভাবে শেখানো হচ্ছে তার উপর। আর সেই শেখানোর দায়িত্বটা শিক্ষকরা স্বেচ্ছায় নিয়েছেন। তবে এই প্রশিক্ষণের বিষয়ে বাঁধডি রুরাল হেলথ এন্ড এনভায়ারনমেন্ট সোসাইটির কর্মীরাও পঞ্চায়েতের সহযোগী সংস্থা হিসাবে যথেষ্ট উদ্যোগ এবং আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই পুষ্টিবাগানের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র হাতে-কলমে কিভাবে সব্জি উৎপাদন করতে হয় তা শেখা নয় এখান থেকে উৎপাদিত সব্জি স্কুলের মিড-ডে মিলেও ব্যবহৃত হবে যা তাদের পুষ্টির মান খানিকটা হলেও বাড়াতে সাহায্য করবে।

> মিড-ডে-মিলের সাথে পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকলাপকে সংযুক্ত করতে হবে। (NCERT)

মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের (সুপ্রিম কোর্ট) কমিশনার মিড-ডে-মিল সহ অন্যান্য সরকারী প্রকল্পগুলি তদারকি করাকালীন যে সুপারিশগুলি করেন তার মধ্যে কয়েকটি হলঃ-

১) স্কুল প্রাঙ্গণে ছোট সব্জি বাগান করার জন্য উৎসাহ দেওয়া।

২) মিড-ডে-মিলের সাথে পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকলাপকে সংযুক্ত করতে হবে। রাজ্য সরকারকে পাঠ্য পুস্তকে এই বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে যা ইতিপূর্বেই NCERT তাদের পাঠ্যপুস্তকের জন্য করে ফেলেছে।

■■

যদি সম্ভব হয় তবে বিদ্যালয়ের সাথে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক ; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। .....এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থকিবে।

- মহির্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষাঙ্গনে পঞ্চায়েতের উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত পিছিয়ে পড়া একটি জেলা পুরুলিয়া।এই জেলার বাঘমুন্ডি ব্লকের অন্তর্গত দুটি পঞ্চায়েত বুড়দা-কালিমাটি এবং সেরেংডি। শহুরে আধুনিকতা এখনও এই এলাকাকে পুরোপুরি স্পর্শ করতে পেরেছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা খুব মুশকিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক কাজ পুরুলিয়ায় শুরু হয়েছে বিগত ছ'মাসের কিছু বেশী সময়। জাতীয় পাঠ্যসূচী কার্যক্রম ২০০৫-এ, স্থানীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত বুড়দা-কালিমাটি এবং সেরেংডির উদ্যোগ এই বিষয়ে অবশ্যই প্রশংসা দাবী করে। শিক্ষা বিষয়ক এই কাজটির মূল উদ্যোক্তা তারাই। স্থানীয় সংগঠন বাঁধডি রুরাল হেলথ অ্যান্ড এনভায়ারনমেন্ট সোসাইটির অবদানও কিছু কম নয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগী সংগঠন হিসাবে তাদের উপরই এই কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব দিয়েছে পঞ্চায়েত। স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলোই ব্যবহার করার কথা বর্তমান পাঠ্যসূচীতে বলা হয়েছে। গ্রামগুলিতে চাষ-বাস বা বনৌষধির বিষয়ে জানেন এমন অনেক মানুষ আছেন। বর্তমান প্রজন্মের গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়, পড়াশুনাও করে, কিন্তু লেখাপড়া করা আর তাকে কাজে লাগিয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারার মত শিক্ষা স্কুলের পাঠ্যক্রম থেকে সরাসরি তারা পায় না। ফলে পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও সে শিক্ষাকে জীবিকার কাজে লাগানোর সুযোগ তারা সব সময় পায় না। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেই জাতীয় পাঠ্যসূচী কার্যক্রম, ২০০৫-এ স্থানীয় প্রাকৃতিক শিল্পকলা, স্থানীয় সম্পদ ও সম্পদ কর্মী (resource person) দের ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা যারা শহরের জীবিকা অর্জনের প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না, তাদের জন্য থাকবে নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দক্ষতা। এছাড়াও কৃষি নির্ভর পশ্চিমবাংলার গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্থানীয় প্রাচীন ও দক্ষ কৃষকদের সাহায্যে চাষের কাজকে তুচ্ছ মনে না করে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী হবে নিজেদের জীবিকা অর্জনের বিকল্প পথ হিসাবে।

■■

স্কুলে ঐতিহ্যশালী ছৌ-নৃত্যের চর্চা শুরু

পুরুলিয়ার প্রাচীন লোকসংস্কৃতি ছৌ নাচ আজ সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। এখানকার যে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ চলছে তাদের এলাকাধীন দুটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ছৌ নাচ শেখানো শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে শিক্ষকদের আগ্রহও লক্ষ্যণীয়। প্রথমে শুরু হয় সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নেতাজী মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে। ছাত্রদের সাথে আলোচনা করে স্থানীয় একজন ছৌ-এর শিক্ষকও পাওয়া গেছে। আগ্রহী ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০জন। ছৌ শিক্ষক শ্রীযুক্ত পোল মাহাত মহাশয়ের আগ্রহ নজর কাড়ে। ছাত্ররা প্রথমে বিষয়টায় আগ্রহ দেখালেও তাদের মধ্যে একটা জড়তা কাজ করত, কিন্তু শ্রীযুক্ত মাহাত-এর উৎসাহপুর্ণ পরিচালনায় তারা অল্পদিনের মধ্যেই সেই জড়তা খুব সহজেই কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়। আজ তাদের এতটাই উৎসাহ যে, তারা তাদের গরমের ছুটিতেও স্কুলে এসেছিল নাচের মহড়ার জন্য। ধীরে ধীরে তাদের শিক্ষাকাল আজ ছয় মাস অতিক্রান্ত হলো এবং বর্তমানে ছাত্র সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০জনে। এর কিছুদিন পর বুড়দা-কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন কালিমাটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রেও ছৌ শেখানো শুরু হয়। সেখানেও ছাত্ররা একইভাবে সমান উৎসাহের সাথে

এরপর তিনের পাতায়

m¤úv`Kxq

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু সেটা আইন দিয়েই কি আদৌ সম্ভব ?

" মানুষের অধিকার মানুষকে চেয়ে নিতে হবে না। অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষ প্রধানতঃ অন্তরের জীব অন্তরেই সে কর্তা বাহিরের লোভ অন্তরের লোকসান ঘটে। "

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

শিক্ষার অধিকার আইনটি সফল ভাবে প্রয়োগ হলেই কি সমাজ জীবনে শিক্ষার উন্নয়ন হবে ? আমরা কি স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন চাইছি, না নিরক্ষরতার উন্নয়ন চাইছি।

শিক্ষা কেবলমাত্র স্কুলের ক্লাসঘর আর ব্ল্যাক বোর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমাজ সংস্কৃতির এটা একটা অঙ্গ যা জীবনে বেঁচে থাকার সার্থকতার মধ্যেই পড়ে এবং দৈনন্দিন জীবনে যা একটা প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের উপরই।

মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির দিকে যদি আলোকপাত করি তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে সবই এক ছাঁচে ঢালা। মূলতঃ শহরকেন্দ্রীক শিক্ষা; অঞ্চলভেদে আঞ্চলিক বিষয় সমুহের সঙ্গে শুরুতেই তার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। তাই বর্তমান শিক্ষা বিষয়ের ধ্যান ধারণাকে খুঁটিয়ে বিচার করে নতুন করে সংযোজন করবার দিন এসেছে। বিদ্যালয়, পরিবার, সমাজ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠী, স্থানীয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কিভাবে একযোগে কাজ করতে পারে সেটার দিকে নজর দেওয়া দরকার। যদিও শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু আইন দিয়ে কি তার প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব ! এতে কি শুধু রাষ্ট্রই দায়বদ্ধ থাকবে নাকি সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষ দায়বদ্ধ থাকবে ?

সংবিধানে ৭৩তম সংশোধনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানকে গ্রামীণ শিক্ষার দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিল। কারণ অন্তত প্রাথমিক-স্তরে শিক্ষার বিষয়বস্তুর চাহিদাটা অঞ্চল-ভিত্তিক। স্থানীয় ভাবে শিক্ষার উন্নয়ন এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া সম্ভব নয়। দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার তার এলাকায় চলা প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজকর্মের নিয়মিত তদারকী করবে, প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ ও তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কোথাও বলা নেই যে, অঞ্চলের চাহিদার উপর ভিত্তি করে অঞ্চলভিত্তিক বিষয়কে পঠন পাঠনের বিষয়বস্তুতে সংযুক্তি ঘটাবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে স্থানীয় ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গ্রামবাংলায় যেসমস্ত সম্পদ আছে যেমন লোককাহিনী, গল্প, বিভিন্ন গোষ্ঠীর গান এগুলো শিশুদের কল্পনা শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় মানুষেরা তাঁদের জীবন জীবিকার উন্নতি ঘটাতে পারে যা বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার মধ্যে পড়ে। সেই দক্ষতা এবং জ্ঞানকে যদি স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে চালিত করা যায় তাহলে আর শিক্ষা শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের একটা যোগাযোগ তৈরি হয়। হাতে কলমে গ্রামীণ জীবন যাপনের উপযোগী নানান কাজ করতে গিয়ে তারা বাস্তব জীবনে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করার একটা প্রেরণা পাবে। এই সম্পূর্ণ কাজটা শুধু আইনি অধিকার বলে হবে না। বরঞ্চ ব্যক্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এক সহমতের ভিত্তিতেই হবে। কারণ ব্যক্তি একটা বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ আর শিক্ষাও একটা সামাজিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ব্যাপার। সেই জন্যই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রের হাত ধরে এভাবেই যদি শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্ম প্রকৃত মানুষ না হয়ে পরিণত হবে যন্ত্রমানুষে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় জোরটা পড়ে যন্ত্র চালনায় দক্ষ ও নিপুন শ্রমিক তথা কারিগর তৈরি করার উপর আর আমাদের বিদ্যালয়গুলি এই তথাকথিত শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় চাহিদা মেটাবার কেন্দ্র- বিন্দু হয়ে উঠছে।

তাই স্থানীয় অঞ্চলভেদে পাঠ্যক্রমে কি বিষয় হবে সেটা স্থানীয় মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের হাতেই থাকা উচিত। ধরা যাক, শিক্ষার অধিকার আইন বলে সব ছেলে মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হলো। সেখান থেকে তারা যা পড়ছে বা শিখছে সেগুলি কি গ্রামীন পরিবেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে? তা যদি না হয় তাহলে স্কুল ছুটের সংখ্যাটা তো ক্রমশঃ বেড়েই চলবে। আটকাবার পথটা তাহলে কোথায়? শিক্ষা অধিকার আইনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে জরুরী বিষয় সেটা হল এমন একটা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া আনা, যার মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের সব উপাদানগুলিই থাকবে। বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেও তা হবে বাস্তব ভিত্তিক ও সহজলভ্য।

আইন দিয়ে যা করা যায় না সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যেই তা লুকিয়ে থাকে, আমাদের কর্তব্য হল সেটাকে জাগিয়ে তোলার পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চালিয়া যাওয়া।

শিশু পঞ্চায়েত

শিশু পঞ্চায়েত বা বাল পঞ্চায়েত একটি কার্যকরী প্রক্রিয়া যা শিশুদের স্ব-শক্তিকরণের মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন এবং অন্যান্য বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়। এটা একেবারেই গ্রাম পঞ্চায়েতের ধারণারই প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ এখানকার সদস্যরা সেই গ্রামেরই শিশুদের দ্বারা নির্বাচিত হয় যেখানে আট থেকে ষোলো জন সদস্য থাকে। এর মধ্যে আবার একজন সভাপতি এবং একজন সম্পাদকও থাকে। UNICEF - এর আর্থিক সাহায্যে এই গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন ইউনিট-টি মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, বিহার ও রাজস্থানের কয়েকটি জেলায় কাজ শুরু করেছে। শিশুরা যাতে এই প্রশাসনিক পদ্ধতি বোঝে ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং পাশাপাশি তাদেরকে যাতে ভোটে দাঁড়ানোর সাহস পেতে সাহায্য করবে এই পদ্ধতি। সংক্ষেপে এমন এক তরুন প্রজন্ম তৈরী হবে যারা সক্রিয় ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক ধারণা সম্পন্ন হবে। তারা সক্ষম হবে নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সিকিমে ব্লক ও পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ১২টি প্রাথমিক স্কুলেও এই বিষয়টি শুরু হয়েছে। যদিও উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রেখেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে শিশুপঞ্চায়েতের কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু শিশুদের মনে এর বীজ কতটা বপন করা গেছে তার মূল্যায়ন আগামীর জন্যই রইল।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বাগমুন্ডি ব্লকের কয়েকটি স্কুলে এই শিশু-পঞ্চায়েত বা শিশু- মন্ত্রী পরিষদ আছে। গত এক বছর ধরে তারা এই দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই স্কুলগুলিতে মন্ত্রী পরিষদ নামক একটি বিষয় চালু আছে যা স্কুল পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এর উদ্দেশ্য সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, স্বাস্থ্য বিষয়ে নজর দেওয়া, নিয়মানুবর্তিতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করা। ছাত্র/ছাত্রীরা ভারপ্রাপ্ত পাঁচজন মন্ত্রীকে মেনে চলে।আর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বক্তব্য "আমাদের খুব ভালো লাগে কাজটা করতে আর মাষ্টার মশাইরাও আমাদের সাহায্য করেন।"

স্কুল পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টির পরিধিকে আরও একটু বিশদ করে যদি সংবিধান স্বীকৃত গ্রামীন স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা শিশুদেরকে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শেখানো সম্ভব হয়, তাহলে আগামীদিনে গ্রামের উন্নয়নে এই শিশুরাই অগ্রনী ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে।

■■

উইলিয়াম অ্যাডামস্-এর চোখে ঊনবিংশ শতকের বাংলার শিক্ষাচিত্র

পর্ব ২ ঃ বীরভূম

1818 mv‡j ¯‹U j¨vÛevmx DBwj qvg A¨vWvgm (1796-1881) fvi‡Z Z_v†Kvj KvZvi Kv‡Q kªivgcy‡i Av‡mb GKRb e¨vcwU÷ wgkbvwi wnmv‡e| †mLv‡bB wZwb ms¯‹Z I evsjv fvlv †k‡Lb| A¨vWvgm †ivRMv‡ii c_ wnmv‡e mi Kwi Kv‡R †hvM †`b| 1835 mv‡j evsjvi ZrKvjxb Mfbi DBwj qvg †ew›U¼-Gi mi Kv‡ii wb‡`‡k evsjv I wenv‡ii wKQzAs‡k wk¶v wb‡q mgx¶v K‡ib| EDUCATION IN BENGAL AND BEHAR GB wk‡ivbv‡g wZbwU chv‡q mgx¶v wi‡cvUwU cKvwkZ nq| fvi‡Z wk¶vi †¶‡Î GB wi‡cvUwU GK Awe¯§iYxq `wj j| 1838mv‡j †kl wi‡cvUwU cKvwkZ nq| eZ gvb wbe‡Üi me Z\_¨ 3q wi‡cvUwU †\_‡K msKwjZ| Avgv‡`i Av‡jvPbv Avgi vmxgvex× ivLe eZgvb cwðge‡½i wZbwU †Rjv, h_v- gywk`vev`,exi fyg I eagvb-Gi g‡a¨| g‡b ivL‡Z n‡e †Rjv¸wj i †m mgqKvi me _vbvq mgx¶vi KvR nq wb| MZ msL¨v‡Z gywk`vev` †Rjvi Z_¨ wb‡q Av‡jvPbv Kiv n‡qwQj| Drmvnx cvVK‡`i bew`kvi c¶ †_‡K Abyiva Kiv n‡"Q Zviv hw` Pvb Av‡Mi msL¨vwUi Rb¨ bew`kvi `ß‡i †hvMv‡hvM Ki‡Z cv‡ib|

বীরভূম জেলার ১৭টি থানাতেই সমীক্ষা হয়। ইতিপূর্বে বর্ণিত সবধরণের স্কুল মিলিয়ে মোট স্কুলের সংখ্যা ৫৪৪। অর্থাৎ থানা প্রতি ৩২টি। তিনটি থানাতে কেবলমাত্র মাতৃভাষায় স্কুল পাওয়া যায় এবং তা সংখ্যায় অন্য থানাগুলির তুলনায় খুবই কম।

৪১২টি মাতৃভাষায় বা দেশীয়ভাষার স্কুলের মধ্যে ৪০৭টিতে বাংলা এবং ৫টিতে হিন্দিতে পড়ালেখা হত। ৫টির মধ্যে একটিতে পুরোপুরি হিন্দিতে, বাকী ৪ টিতে হিন্দি ও বাংলা মিলিয়ে। একটাতে হিন্দি শেখানো হত বাংলা অক্ষরে লিখে।

সমীক্ষায় শিক্ষকদের সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল মোট ৪১২ জন, এদের মধ্যে একজন ক্রিশ্চিয়ান, ৪ জন মুসলমান, বাকী সব হিন্দু। শিক্ষকের গড় বয়স ৩৮ বছর। হিন্দু শিক্ষকদের মধ্যে কায়স্থ শিক্ষক সর্বাধিক, ২৫৬ জন। এর পরেই ব্রাহ্মণ ৮৬জন। মুর্শিদাবাদ জেলার মত এই জেলাতেও তথাকথিত নিচুবর্গের শিক্ষকও ছিল। অ্যাডামস্ প্রায় ১১ জন সহশিক্ষকের দেখা পেয়েছিলেন যারা ছাত্রদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। আর একটি গ্রামের বেশ অবস্থাপন্ন একজন বয়স্ক ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র পড়াতেন আর চাষবাস করে নিজের সংসার চালাতেন। অ্যাডমসের দেওয়া তথ্য অনুসারে বিভিন্ন অংকের পারিশ্রমিক মিলিয়ে ৩২৫ জন শিক্ষকের সর্বমোট সাম্মানিক ছিল মাসে ১১.২৫ টাকা। হিসাবে দেখা গেছে ৪০১ জন শিক্ষকের গড় সাম্মানিক ছিল মাসে ৩ টাকার মত। স্কুলগৃহ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে অ্যাডামস্ বলেছেন, ১ টাকার ৪ আনা খরচ করে একজন শিক্ষক স্কুলগৃহ তৈরি করেন। তাঁর ছাত্ররা জঙ্গল থেকে সামগ্রী জোগাড় করে আনে। আর একটি গ্রামে ছাত্ররা নিজেরাই শ্রম দিয়ে একটি স্কুলগৃহ বানিয়েছিল, খরচ হয়েছিল ১ টাকা ৮ আনা। পাতা, খড় প্রভৃতি দিয়ে ও অন্য সামগ্রী দিয়ে বানানো হয়েছিল। কয়েকটি স্কুলগৃহ অভিভাবক চাঁদায় তৈরি হয়েছিল। এছাড়া বৈঠকখানা, কাছাড়ি বাড়ি, বাড়ির বারান্দা, দোকান ও মন্দিরে পড়ানোর জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হত।

৪১২ টি স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬,৩৮৩ জন, গড়ে স্কুল প্রতি ১৫.১৪ জন। সমীক্ষা চলাকালীন ছাত্রদের বয়সের গড় ছিল ১০.০৫ বছর। পড়াশুনার আগ্রহ যে নিম্নবর্গের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল তা অ্যাডমসের দেওয়া তথ্যেই প্রমাণিত। ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই ছিল সংখ্যায় সব থেকে বেশি, ১৮৫৩ জন। এছাড়া গোয়ালা, বৈশ্য ও অন্যান্য প্রায় সকল বর্গের ছাত্রই ছিল, এমন কী মুচি ও চণ্ডাল ঘরের ছাত্রও ছিল। অ্যাডামস্ বলেছেন, ব্রাহ্মণের এই সংখ্যাধিক্য দেখে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, পার্থিব যেসব কাজ তাদের জাতের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল না, এখন সেসব কাজে তারা অংশগ্রহণ করতে চাইছে। আরও একটি জিনিস অ্যাডামসের চোখে পড়েছিল। তিনি নিচু বর্গের মাত্র দুজন ছাত্রকে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারী স্কুলে দেখেছিলেন। সুতরাং বাকীরা দেশীয়দের পরিচালনাধীন স্কুলেই ছিল।

হিন্দি স্কুলগুলিতে তিনি কাঠের বোর্ড ব্যবহার হতে দেখেছিলেন। বাংলা স্কুলগুলিতে লেখার জন্য পাতা ব্যবহার হত। এমনকী শালপাতাতেও লেখা হত। তবে শুরুতে সবাই মাটিতেই লিখত। শেষ ধাপে এসে কাগজে লিখতো।

এই জেলার ৪১২টি দেশীয় স্কুলে কী শেখানো হত তাও আছে রিপোর্টে। একটি স্কুলে যিশুর নির্দেশাবলী পড়ানো হত; ৩৫টি স্কুলে ব্যবসার হিসাবনিকাশ শেখানো হত; ৪৭টি স্কুলে চাষবাসের হিসাবনিকাশ শেখানো হত; আর ৩১৬টি স্কুলে ব্যবসায়িক ও চাষবাস সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ শেখানো হত। এছাড়া একটি স্কুলে ব্যবসায়িক হিসাব ও লেখার কাজ শেখানো হত এবং ১২টি স্কুলে ব্যবসায়িক হিসাব ও চাষবাসের হিসাবনিকাশ ও তার সাথে লেখার কাজ শেখানো হত। অ্যাডামস্ ৮টি স্কুলে শুভঙ্করী পদ্ধতিতে অংক করাতে দেখেছিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

স্কুলে ঐতিহ্যশালী ছৌ-নৃত্যের চর্চা শুরু

..... প্রথম পাতার পর

স্থানীয় সংস্কৃতি ধরে রাখার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে।

কাঠিনাচ ঃ এলাকার শিক্ষকদের স্থানীয় লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানান ঝুমুর, টুসু, ছৌ, করম, বিহা ইত্যাদি এখানকার লোক

সংস্কৃতি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ছৌ হচ্ছে ছেলেদের নাচ আর তাই ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রসঙ্গে তারা বলেন, ব্রতচারী নাচ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাথে নাচ বা গান শুরু করালে ভালো হয়। গ্রামে এই সব শেখানোর জন্য কোনও শিক্ষক পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলে তারা বলেন খোঁজ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তাদের জানানো হয়, স্থানীয় সংসদ এলাকার সম্পদ কর্মী চিহ্নিত করে তাকে সেই সংসদ এলাকার কাজে লাগানোটাই পঞ্চায়েতের লক্ষ্য। একই সাথে তাদের ছাত্রীদের কাঠি নাচ শেখানোর ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া হলে তারা সহমত হলেও ছাত্রীদের মতামতেরও প্রয়োজন বলে জানান। পরবর্তী কালে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করা হয় এবং তারা কাঠি নাচ শিখতে রাজি হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কালিমাটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে কাঠি নাচ শুরু হয় এপ্রিল মাস থেকে। প্রথমে ১২জন ছাত্রী শেখার জন্য নাম দেয় এবং নিজেদের আগ্রহে কাঠি নাচের প্রয়োজনীয় ২টি কাঠি বানিয়ে নিয়ে আসে। এখন ছাত্রীদের কাঠি নাচ ও তার সাথে গান শেখার আগ্রহ বেড়েছে এবং তারা তাড়াতাড়ি শিখেও নিচ্ছে। তাদের দেখে আরও ৭জন ছাত্রী এই দলে যুক্ত হয়েছে।

ভবিষ্যতে আরো সংখ্যা বাড়বে বলে আশা করা যায়।একই ভাবে গোবিন্দডি নেতাজী মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করে সেখানেও মে মাস থেকে কাঠিনাচের ক্লাস শুরু হয়। শুরুতে তাদের মধ্যে জড়তা থাকলেও বর্তমানে তারা আগের চেয়ে উৎসাহী হয়েছে। আর তাই শুরুতে ছাত্রীসংখ্যা ৫জন থাকলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ তে।

একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলছে আনুষাঙ্গিক হয়ে।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোত্তো-চান - জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট মেয়েটি

স্কুলের চার দেওয়ালের বন্দি জীবন থেকে বেরিয়ে একটি মেয়ে কি ভাবে স্বাধীন জীবন যাপনের শিক্ষা পেল সেই নিয়েই গল্প তোত্তো-চান। তোত্তো-চান কথাটির অর্থ অনেকটা ছোট্ট খুকুর কাছাকাছি। জাপানের জনপ্রিয় টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, তেৎসুকো কুরোয়ানাগি ছিলেন এই স্কুলের ছাত্রী। তার বইটিতে তিনি শুধু যে তার স্কুল এবং সহপাঠীদের কথা বলেছেন তা নয়, এর মাধ্যমে তিনি অন্য এক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। তেৎসুকোর এই রচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার। ফলে এই লেখার মধ্যে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি সেই সময় জাপানের অবস্থার কথাও খানিকটা জানতে পারি।

তোত্তো-চান বইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তার স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রধান শিক্ষক সোসাকু কোবায়াশির কথা। যিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষার মধ্যে খোলামন আর স্বাধীন ভাবে কিছু করার অধিকার থাকা প্রয়োজন,আর তা তিনি তার স্কুলে প্রয়োগ করতেন।

শিক্ষাতে খোলামনের দৃষ্টান্ত আমরা বইটিতে বহুবার দেখেছি। তোত্তো-চানের পড়ার থেকে জানলায় দাঁড়িয়ে বাজনাওয়ালাদের ডাক অনেক বেশী আকর্ষণীয় লাগত। আর তার কাজ ক্লাসের অন্য বাচ্চাদের সাথে দিদিমণিদের কাছেও ছিল অসুবিধাজনক। ফলে ওই স্কুলে তার আর পড়া হয় না।

ছোটদের মননশীলতার এমনই নানারকম ব্যাখ্যা এই বইটিতে আমরা পেয়ে থাকি।

এই বইটির আরও একটি লক্ষ্যণীয় দিক হলো বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার ব্যাপারে পরিবারের ভূমিকা। তোত্তো-চানের মা তার দুষ্টুমিতে বিরক্ত না হয়ে বরং তাকে বুঝবে এমন এক স্কুলের সন্ধান করতে করতেই এই স্কুলটি খুঁজে পান। সেদিনের তোত্তো-চান বা এই বইটির লেখিকা তেৎসুকো এই অন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসেই হয়তো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হতে পেরেছেন।

শিশুদের জন্য স্কুল বা পড়াশুনা যে আনন্দময় করে তোলা সম্ভব, মৌসুমী ভৌমিক অনুদিত এই বইটি তারই একটি নিদর্শন। অনুবাদ সাহিত্যে এই বইটি নিঃসন্দেহে তার নিজস্ব জায়গা করে নেবে।

নবদিশার পাঠক/পাঠিকা বা বিশ্বে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন বা প্রকৃত মানুষ গড়ার স্বপ্ন দেখেন তাদের কাছে এই বইটি একটি মূল্যবান সংগ্রহ।

বইঃ- তোত্তো-চান
লেখকঃ- তেৎসুকো কুরোয়ানাগি
বাংলায় আনুবাদঃ- মৌসুমী ভৌমিক
প্রকাশকঃ- ন্যাশানাল বুকট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া
দামঃ- ৬০ টাকা।

■■

আপনাদের ব্যবহারের জন্য

'ভালো খাও ,ভালো থাকো' আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা বিষয়ে। ১৮৯২ সালে শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ ক্রিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। .....একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।'

রবীন্দ্রনাথের এই রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাবিধান মেনে শিক্ষাগত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এই পুস্তিকা তৈরি করা হয়েছে। যাতে শিশুদের মধ্যে গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে। আমরা জানি, যে পরিবেশে শিশুরা বড়ো হয়ে উঠছে সেই পরিবেশেই তার শিক্ষার প্রাথমিক ও মৌলিক ভিত্তি। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার অনুশীলনে তাদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই যথার্থ সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে শিশুদের নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণ করার সামর্থ্যও গড়ে ওঠে না। 'তাই এহেন পরিস্থিতিতে ভালো খাও ভালো থাকো' পুস্তিকার প্রযুক্তি সহ ব্যবহার শিশুদের কাছে শুধু আনন্দদায়কই হবে না, তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধিয় নানা কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে। তাদের স্বাভাবিক সৃজনশক্তি, কল্পনাশক্তির সাহায্যে নিজেরাই নিজেদের সচেতন করবে। তবে এ বিষয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাদেরও যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে। শিখনকে যত বৈচিত্র্য পূর্ণভাবে শিশুদের সামনে তুলে ধরা যাবে ততই তাদের জ্ঞানের পরিসর বাড়তে থাকবে। তাই এই প্রযুক্তি নির্ভর পুস্তিকার বৈচিত্র্যতা শিশু মনে আনন্দের সঞ্চার করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞাপনের উত্তেজক ও আকর্ষণীয় হাতছানি আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামীণ জীবনকেও প্রলুব্ধ করেছে। তার আকর্ষণ থেকে বাদ যায়নি শিশুদের শৈশবও। নানাবিধ মশলাদার, সুস্বাদু খাবারের লোভ শিশুদের খাদ্যাভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটায়। তার সাথে শ্রেণিকক্ষের,

জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন শিখনপ্রণালী জ্ঞান নির্মানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শৈশব মুখোমুখি হয় অপুষ্টির, রক্তাল্পতার ও নানাবিধ অসুস্থতার। রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য শুধু শিশুর ক্ষতি করে না, ভেঙ্গে দেয় সামগ্রিক সমাজের স্বাস্থ্যও। তাই খাদ্যাভ্যাসের নানা খুঁটিনাটি মজা করে, স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়। ছোটো ছোটো গল্প, ছড়া, সিনেমার ব্যবহারে এই শিখন পদ্ধতি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত।

স্থানীয় নানা শাক, সবজি, ফলের নিয়মিত ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে, ছোটো ছোটো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুমনকে স্বাস্থ্যসচেতন করে তোলার প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। এই প্রযুক্তি নির্ভর পুস্তিকাটির ছত্রে ছত্রে রয়েছে নানা মজা। শিশুমনে এই মজাকে সঞ্চারিত করতে গেলে শিক্ষক/শিক্ষিকাদেরও মজা পাওয়া দরকার। ডিভিডিটি চালিয়ে দিলে তাৎক্ষনিক মজা পাওয়া যাবে। কিন্তু এর কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবেনা। তাই এই পুস্তিকাতে বিবৃত সকল নিয়মাবলীকে ভালো করে পড়ে তবেই শিশুদের কাছে উপস্থাপন করা উচিত। এতে শিশুদের পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ ঘটবে। চটজলদি নানা খাবার তৈরির প্রকৌশল জানবে। খাবারের নানা পুষ্টিগুণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে। নিজের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সঠিক খাবার নির্বাচন করবে। এই প্রয়াসে বড়দের অংশগ্রহণকে যথার্থতা প্রদান, প্রশংসার দাবি রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, "শিশুকাল হইতে কেবল স্মরণ-শক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথা পরিমানে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনা অবসর দিতে হইবে।" ডিভিডি সহ 'ভালো খাও, ভালো থাকো' পুস্তিকাটি শিশুদের স্মরণশক্তির পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত নয়।

শিশুর চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনা করতে, তাদের নিজ ভাবনাচিন্তার সঠিক প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই রচিত। তাই সকলের সাহায্য নিয়ে এই প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষণ-শিখণ পদ্ধতি শিশুমনকে সমৃদ্ধ করুক। শিশুদের স্বাস্থ্যসচেতন করার মাধ্যমে আরো প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠুক সামগ্রিক পরিবেশ।

■■

কোন পথে শিক্ষা-একটি ছোট গল্প

শহর থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে একটি অজ গাঁ সৃজনপুর। সেই গ্রামেরই কালিমাষ্টারের বড় ছেলে মাধব থাকে শহর কলকাতায়। বড় আপিসে চাকরি করে। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে তার সুখের সংসার। তবুও সে ছোটবেলায় গ্রামে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না। একদিন সে তার বউ মায়াকে ডেকে বলল, 'মায়া চল আমরা আমাদের গাঁ থেকে ঘুরে আসি। শহরের ইঁট-কাঠ-পাথরের মধ্যে থেকে থেকে বড় একঘেয়ে লাগছে;মনটাও টানছে আমার জন্ম ভিটের জন্য।' মাধবের বউ বিরক্ত হয়ে বলল, 'সেই অজ গাঁ সৃজনপুর! থাকার ভালো জায়গা নেই, লাইট নেই, চারিদিকে নোংরা ওই পরিবেশে আমি আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতে পারব না। তোমার যদি অতই মন টানে তুমি যাও।' মাধব অত্যন্ত কষ্টের সাথে বলে, 'যে গাঁয়ের মাটিতে আমি জন্মেছি তাকে ভুলি কি করে বলতো?'

পরের দিন মনস্থির করে সে সৃজনপুরের বাসে উঠে বসে। অনেকদিন পর গ্রামে যাচ্ছে, ভিতরে একটা উত্তেজনাও কাজ করছে। বাস থেকে নেমে সে দেখে তার সেই চেনা সৃজনপুর অনেকটাই বদলে গেছে, কেমন যেন অচেনা লাগে তার। যে বট- গাছটার নিচে বসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা জমাতো সেটাতো আর নেই,অনেক দোকান-পসার হয়ে গেছে যেখানে মাত্র তিন-চারটে দোকান ছিল।

এইসব ভাবতে ভাবতে আনমনেই হাঁটছিল মাধব। হঠাৎই দেখা নয়ন কবিয়ালের সাথে। কবিয়াল কাকা বলে সামনে এগিয়ে যায় মাধব বলে, "আমাকে চিনতে পারছো কাকা?" কবিয়াল কাকা বলেন, তোকে তো বাবা ঠিক চিনতে পারছি না! আরে আমি তোমাদের কালি- মাষ্টারের বড় ছেলে মাধব।

সে কবিয়াল কাকাকে প্রণাম করে। তাকে আশীর্বাদ করে কাকা বল্লেন,'এবার চিনতে পেরেছি; কতদিন পরে তোকে দেখছি তাই ঠাওর করতে পারিনি।তা কেমন আছিস বাবা? শুনেছি তুই কলকাতায় কোন বড় আপিসে চাকরি করিস, বউমা আর ছেলেমেয়েরা সব ভালো তো?' মাধব-'হ্যাঁ, কাকা সবাই ভালো আছে, কিন্তু তুমি যাচ্ছো কোথায়? আজ কি কোনও গাঁয়ে কবির আসর বসবে?' কবিয়াল-'নারে আমি আমাদের প্রাইমারী স্কুলে যাচ্ছি কবি গান শেখাতে'। মাধব খুব অবাক হয় কবিয়ালের কথা শুনে। কিন্তু তার অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। কবিয়াল বলেই চলেন,'হ্যাঁরে এ আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ।

এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি কবিগান যাতে প্রাথমিক স্কুলের বাচ্চারা শিখতে পারে এই উদ্যোগ তারই জন্য।' তিনি খুব গর্বের সাথে বলেন, 'আমি এখন শুধু কবিয়াল নই, কবিয়াল-মাষ্টারও' বলে হা হা করে হাসতে থাকেন। মাধব- তুমি কি স্কুলে মাষ্টারি পেয়েছ কাকা? কবিয়াল- আরে না না সপ্তাহে দু ঘণ্টা করে স্কুলে শেখাই,তবে তার জন্য পঞ্চায়েত একটা সান্মানিক দেয়। আর কবিয়াল হিসাবে গ্রামের ছেলে মেয়েদের কবিগান শেখানোটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমি একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব কিন্তু এই প্রজন্মের মধ্যেই বেঁচে থাকবে গ্রামের লোক-সংস্কৃতি। নাহলে তারা তো কোনও দিন জানতেই পারবে না এটা কত বড় সম্পদ! মাধব অবাক হয়ে শুনতে থাকে। কবিয়াল কাকা বলেই চলেন, অবাক লাগছে তাই নারে? এতদিন তোরা জেনে এসেছিস বই পড়া, মুখস্থ করা, পরীক্ষায় পাস করার শেষে চাকরি। মাধব- হ্যাঁ, সেটাই তো শিক্ষা;আর সেই শিক্ষা পেয়েইতো কলকাতা শহরে বড় আপিসে চাকরি নিয়েছি। সুখের জন্যই তো কষ্ট করে লেখাপড়া শেখা। আর সবাই প্রতিনিয়ত সেই সুখের পিছনে ছুটে চলেছে। কবিয়াল কাকা- এখন কি হাঁপিয়ে পড়েছিস বলে গ্রামের কথা মনে পড়ল ?'

কবিয়াল কাকার মুখে এই কথাটা শুনে মাধব একটু ধাক্কা খেল। এদিকে কবিয়াল তার দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে স্কুলের দিকে পা বাড়ালেন।

মাধব তার ব্যাগ থেকে ঠান্ডা জলের বোতলটা বার করে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে নিজে একটু ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করল কারণ কবিয়াল কাকার কথাটা তার মাথায় ঘুরছে আর সেটা ভাবতে ভাবতেই সে একটা রিক্সায় উঠে সোজা এসে একটা প্রাইমারী স্কুলের বোর্ড দেখে তার সামনে রিক্সাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলল। জিজ্ঞাসা করল, এটাই কি সৃজনপুর প্রাইমারী স্কুল? রিকশাওয়ালা বলল-হ্যাঁ বাবু, এটাই তো এখানকার প্রাইমারী স্কুল। মাধব অবাক নয়নে তাকিয়ে রইল আর মনে মনে চিন্তা করতে লাগল যে কত বদলে গেছে সেদিনের স্কুলটা। আগে ছিল খড়ের চাল আর ছোট কুটির; আর এখন পাকাঘর,পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আর সেই পাঁচিলের গায়ে সব মনীষীদের ছবি আঁকা।

সেইসব ছবি এঁকেছে স্কুলের ছেলেমেয়েরা। তারা সমাজ সম্পর্কে যে সমস্ত মূল্যবান কথা বলেছেন সেগুলোও লেখা আছে। কিন্তু তার অবাক হওয়ার আরও বাকী ছিল। গেট পেরিয়ে স্কুলে ঢুকতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য তার চোখে পড়ল। স্কুলের শুরুতে যে প্রার্থনা সঙ্গীত হতো এখন তার জায়গায় বাচ্চারা কবিগান গাইছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সে গানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং কবিয়াল কাকা।

আরও আশ্চর্য হয় স্কুলে এই সময়ে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানকে দেখে।হঠাৎ মাধবকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবনীবাবু দেখে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে বলেন, আরে তুমি কালীবাবুর ছেলে না? দেখেছ, তোমায় ঠিক চিনতে পেরেছি। আর পারব নাইবা কেন, তুমি যে আমার স্কুলের মেধাবী ছাত্র ছিলে। মাধব মাষ্টার- মশাইকে প্রণাম করে। তিনি বলেন-তা কেমন আছো? শুনেছি তুমি কলকাতায় বড় চাকরী পেয়েছ? বেশ ভাল। মাধব-'সব কত বদলে গেছে তাই না?' আমাদের স্কুলের পাশে এই সবজী বাগানটা কারা করেছে মাষ্টার মশাই? মাষ্টারমশাই-'এর পুরো কৃতিত্বটাই এই স্কুলের ছেলে-মেয়েদের,আমি কেবল পাশে থেকে সহায়তা করেছি মাত্র। আর সবচেয়ে বড় কথা এই উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রামবাসীরা সবাই একসাথে আছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা কি জানো ? আজ পরিবার,সমাজ,স্কুল সবই একসূত্রে বাঁধা। স্কুলটা আর সমাজ ও পরিবারের বাইরে একটা দ্বীপের মত হয়ে নেই। গোটা গ্রামটাই একটা স্কুল। এই দেখ না পঞ্চায়েত প্রধানও আজ এখানে উপস্থিত।' এ প্রশ্ন যে মাধবের মনে আসেনি তা নয় কিন্তু সে সংকোচে জিজ্ঞাসা করতে পারছিল না,আর তাছাড়া আজ তার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাষ্টারমশাই বলে চলেন, 'স্কুলটা ওনার অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে, সামাজিক সংগঠন হিসাবে এই স্কুলের উন্নয়নের বিষয়ে নজর দিয়ে কিছু করাটা ওনার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।' মাধব ক্রমশঃই অবাক হয় আর ভাবে যে, স্কুলটা আজ আর চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সমাজের সাথে একেবারে মিশে গেছে। ব্যথিত স্বরে মাষ্টারমশাইকে মাধব বলে, 'আমাদের সময়ে যদি এমনটাই ঘটতো তাহলে আজ আর আমায় গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হোতো না,আর মূল্যবোধেরও এমন ভাঙন ধরতো না। মাষ্টারমশাই, আসলে পুঁথিগত শিক্ষা কখনও মূল্য-বোধের সঞ্চার করতে পারে না। স্কুল জীবনের সাথে বাইরের জীবনের মধ্যে একটা সম্পর্ক না থাকলে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হয় না।'

মাধবের সাথে পঞ্চায়েত প্রধানের আলাপ করিয়ে দেন মাষ্টারমশাই। বলেন, মাধব আমাদের এই স্কুলেরই প্রাক্তন মেধাবী ছাত্র, এখন চাকরী সূত্রে শহরে থাকে। প্রধানের পাশে চেয়ারে বসে সে প্রধান আর ছাত্রদের মধ্যে চলা গল্প শুনতে থাকে। বেশ লাগছিল তার। এরপর প্রধান ছাত্র ও শিক্ষকদের একটা খবর দেন। খবরটা এইরকম, উনি রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যান দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে আগামীকাল থেকেই ছাত্রদের খেলাধূলার জন্য একজন কোচ ঠিক করেছেন, যিনি আগামীকাল বেলা তিনটায় স্কুলে আসবেন সবার সাথে আলাপ করতে। খবরটা শুনে ছাত্র ও শিক্ষক সবাই হৈ হৈ করে ওঠেন। এরপর সবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রধান বিদায় নেন।

মাধব প্রধান শিক্ষক অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করে, 'এখন প্রার্থনার সময় জাতীয় সঙ্গীত না করে অন্য কিছু করা হয়। কিন্তু কেন?' অবনীবাবু বলেন, 'এগুলো আমরা নতুন যোগ করেছি। এছাড়া গ্রামে যারা ভালো গল্প জানেন,যে গল্পের মধ্যে নীতিবোধ বা মূল্যবোধ আছে সেই গল্পগুলো ছাত্রদের সামনে তাদেরকে দিয়ে বলানো হয়। স্কুলের পাঠ্যক্রমের সাথে অঞ্চলের জ্ঞান ও দক্ষতাকে মেলানোর একটা চেষ্টা বলা যেতে পারে। আর বাচ্চারা যদি নিজের অঞ্চলকে না চিনল তাহলে তো তার শিক্ষাটাই সম্পূর্ণ হোলো না। সবচেয়ে বড় কথা হোলো এটা করা হচ্ছে স্কুলের সূচিকে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটিয়েই। আনন্দের সঙ্গে শিখতে শিখতে ছাত্ররা একদিন এই সমাজের মঙ্গলের জন্য দায়িত্ববান হয়ে উঠবে। সবচেয়ে বড় কথা কি জান মাধব ? সবাই তো আর ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হতে পারবে না বা শহরে গিয়ে তোমার মত চাকরিও পাবে না। তারা কি করবে বলো? তাহলে তাদের জন্য পড়ে রইল একটা হতাশাগ্রস্ত জীবন। তাই এখন থেকে যেটা চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে সারাজীবন তারা কোন, না কোন, কাজ করতে পারে। আর সেই বিষয়ে তাদের একটা দক্ষতা তৈরী করতে চেষ্টা করা।' একথা বলে

তিনি মাধবকে সবজী বাগানের দিকে নিয়ে যান। বাগানটা দেখিয়ে তিনি বলেন, 'এই যে বাগানটা দেখছ এটা গ্রামেরই একজন অভিজ্ঞ চাষীর কাছ থেকে ছাত্ররা হাতে কলমে বাগান তৈরীর কাজটা শিখছে। ছাত্ররা জল দেয়, রক্ষণাবেক্ষণ করে আর অভিভাবকরাও তাদের সাহায্য করে। বই পড়ে তারা পুষ্টি সম্বন্ধে জানতে পারছে আর হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে তাদের একটা দক্ষতা তৈরী হচ্ছে।' মাধব অবনীবাবুর কাছ থেকে সব শুনে বলল, 'এ বড় চমৎকার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। স্কুলের সাথে অঞ্চলের এই যে সেতু আপনারা রচনা করেছেন, তাতে মনে হচ্ছে, সত্যি গোটা গ্রামটাই যেন একটা শিক্ষাকেন্দ্র। আমাদের সময়ে যদি এমনটা হোত তাহলে হয়ত আমরা এমন আত্মকেন্দ্রীক ও মূল্যবোধহীন মানুষ হতাম না।'

'এই পথেই হয়ত প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা যায়। আপনাকে তথা আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামী প্রজন্মের সুস্থভাবে বাঁচার রাস্তাটা আপনারাই দেখিয়ে দিচ্ছেন।' এই বলে মাধব বাড়ীর পথে রওনা হল, তার মনে হচ্ছে, সে আজ গ্রামে না এলে তার অনেক কিছু জানার বাকী থেকে যেত।

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/জি কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা -৭০০০১৯ হইতে প্রকাশিত ও শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY